আল্-ফাতিহা / আবুল হাশিম

আল্‌-ফাতিহা

আবুল হাশিম

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

আল্-ফাতিহা
আবুল হাশিম
ইসাকেঢা-প্র/২

প্রকাশক :

মুহম্মদ মনসুর-উদ্-দৌলাহ্ পাহলোয়ান
সহকারী পরিচালক
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা বিভাগ
৬৭, বায়তুল মুকাররাম, (তেতলা)
ঢাকা-২, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ :

আবদুর রউফ সরকার

প্রথম প্রকাশ : ১৯৭০
দ্বিতীয় প্রকাশ : মার্চ ১৯৮০
চৈত্র ১৩৮৬ : জমাদিউল আউয়াল ১৪০০

মুদ্রক :

আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশ দাশ লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১

মূল্য : তিন টাকা মাত্র

AL FATIHA : A Bengali Commentary of Al-Fatiha, the opening chapter of the Holy Quran By Abul Hashim and published by Islamic Cultural Centre, Dacca Division, Dacca-2. Price : Taka 3·00 only.

ভূমিকা

ইসলামী চিন্তাধারার ইতিহাসে প্রখ্যাত দার্শনিক-লেখক মরহুম আবুল হাশিমের অবদান মৌলিক ও অনন্য। কুরআনুল করীমের আলোকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর সুতীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ সকলকেই সব সময় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছে। আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত মরহুম আবুল হাশিমের রচনা ও ভাষণ উভয় ক্ষেত্রেই কুরআনের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও কুরআন শরীফের কোন পূর্ণাঙ্গ তফসীর তিনি লিখে যাননি। অবশ্য এ ধরনের একটা বাসনা জীবনকালে তিনি প্রায়ই প্রকাশ করতেন। কুরআনুল করীমের তফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর একমাত্র অবদান প্রথম সূরা "আল্-ফাতিহা"র তফসীর। আমরা মরহুমের এই অনন্য কীর্তি "আল্-ফাতিহা"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করছি এ জন্যে যে, সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও এ তফসীরের মধ্যে রয়েছে এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী।

"আল্-ফাতিহা" যে কোন সালাতে অবশ্য-ব্যবহার্য সূরা। "আল্-ফাতিহা"র তফসীর করতে লেখক সালাতের মর্মবাণীও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ফলে বিষয়-বস্তুর আলোচনা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

ঢাকা বিভাগীয় ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-এর পক্ষ থেকে "আল্-ফাতিহা" প্রকাশের এ শুভ মুহূর্তে আমরা মরহুম আবুল হাশিমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ্ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

আবদুল গফুর
আবাসিক পরিচালক
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

আল্-ফাতিহা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين ○ الرحمن الرحيم ○ ملك يوم الدين ○

সকল হাম্দ মহা-বিশ্বের রব্, রহমান, রহীম এবং দ্বীন-দিবসের মালিক আল্লাহ্‌র।

اياك نعبد و اياك نستعين ○ اهدنا الصراط المستقيم ○

আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং একমাত্র তোমারই সাহায্য যাচ্ঞা করি।

صراط الذين انعمت عليهم ○ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ○

আমাদিগকে তুমি সরল-পথে পরিচালিত কর—যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ তাহাদের পথে, অভিশপ্ত ও বিপথগামীদের পথে নহে।

মুখবন্ধ

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইবনে আফ্ফানকে (রাঃ) جامع القران অর্থাৎ কুরআনুল করীমের সংগ্রাহক বলা হয়। এ কথার তাৎপর্য ইহা নহে যে, তিনিই কুরআনুল করীমের আয়াত ও সূরাসমূহের ক্রম-পর্যায় স্থির করিয়াছিলেন। আমরা যে অবস্থায় কুরআনুল করীম পাইয়াছি, রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবিতাবস্থায় উহা সেভাবেই লিখিত ও পঠিত হইত। এ ব্যাপারে হযরত উসমান বা অন্য কাহারও হস্তক্ষেপের কোন অবকাশই ছিল না। রসূলে আক-রামের ইন্তিকালের পর খিলাফত অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। তখন খিলাফতের সর্বত্র কুরআনুল করীমকে লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ আশংকা করেন যে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা কুরআনুল করীম বিক্ষিপ্ত-ভাবে লিপিবদ্ধ হইলে ভুলক্রমে মু'মিনদিগের দ্বারা এবং দুষ্ট-বুদ্ধি-

প্রণোদিত ইসলাম-বিরোধীদের দ্বারা এই মহাগ্রন্থের পাঠ-বিকৃতি ঘটিতে পারে। এমতাবস্থায় কুরআনুল করীমের বিক্ষিপ্ত লিপিগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া মদীনায় আনয়ন করার এবং সেগুলির পরিবর্তে রসূলে আকরামের জীবন-কালে প্রচলিত পাঠ অনুযায়ী একটি প্রামাণ্য ও বিশুদ্ধ লিপি সংকলন করিয়া সর্বত্র উহার প্রতিলিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হযরত আবু বকরের খিলাফতের আমলে এই কার্য আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় হযরত উসমানের খিলাফতের আমলে। এই কারণেই হযরত উসমানকে 'জামি'উল কুরআন' বলা হয়। এতদ্ব্যতীত 'জামি'উল কুরআন'—এ কথার অন্য কোনই তাৎপর্য নাই।

সাতটি সারগর্ভ আয়াতসম্বলিত সূরা আল্-ফাতিহা কুরআনুল করীমের এক শত চোদ্দ সূরার মধ্যে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। এই সূরার দ্বারা কুরআনুল করীমের পাঠ আরম্ভ হয় বলিয়া ইহাকে সূরা আল্-ফাতিহা অর্থাৎ 'উদ্বোধনী অধ্যায়' বলা হয়। সূরা ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' অর্থাৎ 'কুরআনের মাতা' এবং 'রুহুল কুরআন' অর্থাৎ 'কুরআনের আত্মা'ও বলা হইয়া থাকে। মাতৃ-গর্ভে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পূর্ণাংগ মানবের সম্ভাবনা ভ্রূণ আকারে নিহিত থাকে এবং অতি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে সুপ্ত থাকে বিরাট মহীরুহের ভবিষ্যত বিকাশ। এই ভাবে আল্-ফাতিহার মধ্যেও বীজ আকারে রহিয়াছে সমগ্র কুরআনুল করীম। পরবর্তী ১১৩টি সূরা এই আল্-ফাতিহার বাণীরই ব্যাখ্যা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই কারণেই সালাতের প্রত্যেক রুকুতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ অর্থাৎ অবশ্য-কর্তব্য। কুরআনুল করীমের বীজমন্ত্র আল-ফাতিহার গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলে উহার অবশিষ্ট অংশ স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য হইয়া যায়। প্রবেশদ্বার উদ্ঘাটন করিতে না পারিলে যেরূপ নগর-প্রবেশ ও নগর-দর্শন অসম্ভব, তেমনি আল-ফাতিহার বাণীর মর্মোপলব্ধি ব্যতিরেকে জ্ঞানের আকর কুরআনুল করীমের অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং উহার মর্মোপলব্ধিও অসম্ভব।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মূল বিষয় কি? প্রত্যেক গ্রন্থের কোন না কোন মূল আলোচ্য বিষয় থাকে; কিন্তু যেহেতু কোন একটি বিশেষ জ্ঞান অপরাপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত সম্পর্কহীন বা সেগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, তাই কোন একটি বিষয় আলোচনা করিতে হইলে উহার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কতগুলি বিষয়ও আলোচনা করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আলোচ্য বিষয় সমাজ-বিজ্ঞান হইলে সমাজ-বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির আলোচনা

প্রসংগে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। এইরূপে জীব-বিজ্ঞান আলোচনা প্রসংগেও অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়ে রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনা। কুরআনুল করীমে অনেক প্রাগৈতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে বলিয়া ইহাকে ইতিহাসগ্রন্হ বলা সংগত হইবে না। কারণ, প্রাগৈতিহাসিক ঘটনাবলীর উল্লেখ নিতান্তই প্রাসংগিক। কুরআনুল করীমের মূল আলোচ্য বিষয় হইতেছে অবিকৃত ও বিশুদ্ধ মানব-প্রকৃতির পরিচয় ও বিশ্লেষণ, মানুষের সহিত তাহার স্রষ্টার সম্পর্ক এবং মানুষের সহিত স্রষ্টার সৃষ্টির সম্পর্ক। এগুলিকে সহজবোধ্য করার প্রয়োজন এবং মানুষের অপরিসীম সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের পথ-নির্দেশের জন্য তত্ত্বকথা, নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক আইন-কানুন প্রভৃতি মানব জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। এগুলি সবই মূল বিষয়গুলির সুস্পষ্ট পরিচয়ের জন্য ব্যবহৃত পার্শ্ব-রশ্মি (side-light)। আল্-ফাতিহার প্রথম তিনটি আয়াতে মানুষের সহিত তাহার স্রষ্টার গূঢ় সম্পর্কের ও সৃষ্টিতে বিরাজমান আল্লাহ্‌র সক্রিয় ভূমিকার 'মারেফাত' অর্থাৎ পরিচয় রহিয়াছে এবং মানুষকে তাহার ঈপ্সিত গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অর্জন করিতে হইলে যে মনোভংগির প্রয়োজন তাহার ইংগিত আছে। চতুর্থ আয়াতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় রহিয়াছে এবং সেই সংগে আছে মানুষের সহিত আল্লাহ্ তাআলার অপরাপর সৃষ্টির সম্পর্কের পরিচয়। শেষ তিন আয়াতে, মানুষের কর্মফল কিরূপে সক্রিয়ভাবে তাহার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করে এবং জীবনের কোন পথ অবলম্বন করিলে জীবন সার্থক হয়, তাহার নির্দেশ আছে। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, মি'রাজের মাধ্যমে, আল্লাহ্‌ রসূলে করীমকে (দঃ) এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান দান করেন। মি'রাজে রসূলে করীম প্রত্যক্ষ করেন মহাবিশ্বের স্বরূপ, সৃষ্টিতে স্রষ্টার সক্রিয় ভূমিকা এবং মানুষের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণে কর্ম-ফলের অমোঘ সম্পর্ক। মহাগ্রন্হ আল-কুরআনের প্রতিটি আয়াত ও মহানবী মুহম্মদ মুস্তফার (দঃ) জীবনের প্রতিটি শিক্ষা আল্-ফাতিহার এই জ্ঞানামৃত-রসে সম্পৃক্ত।

১.

সকল 'হাম্‌দ্' মহাবিশ্বের রব আল্লাহ্‌র। আরবী 'হাম্‌দ্' শব্দটির পূর্ণ অর্থবোধক প্রতিশব্দ অন্য কোন ভাষায় নাই। শব্দটির অনুবাদ

করিবার চেষ্টা করিলে ইহাতে বিধৃত ধারণাকে ক্ষুণ্ণ করা হইবে। আরবী ভাষায় অন্য একটি শব্দ আছে 'শুকুর'। 'শুকুর' শব্দটির অর্থ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। এ শব্দটি আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁহার বান্দা মানুষ, উভয়ের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু 'হাম্দ' শব্দটি কেবল আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হইয়াছে। হাম্দের দ্বারা সাধারণ প্রশংসা বুঝায় না। ইহা বুদ্ধি-বিবেচনা-চেষ্টানিরপেক্ষ النفس المطمئنة অর্থাৎ নির্বিকার চিত্তের নিষ্কাম ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা। 'হাম্দ' এইরূপ প্রশংসা, যাহা চিত্ত যখন যাবতীয় গ্লানি, ভীতি ও আশংকামুক্ত হইয়া অনাবিল আনন্দ ও নিরাপত্তার আস্বাদ উপলব্ধি করে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উচ্চারিত হয়। কেহ আমাদের কোন উপকার করিলে শিষ্টাচারের অভিব্যক্তি হিসাবে আমরা তাহাকে আমাদের 'শুকুর' অর্থাৎ কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া থাকি। প্রথমতঃ এই 'শুকুর' জ্ঞাপন নির্বিশেষ নহে, বিশেষ ; অর্থাৎ বিশেষ কোন একটি উপকারের বিনিময়ে ইহা প্রদত্ত, উপকার-বিশেষ-নিরপেক্ষ নহে। দ্বিতীয়তঃ এই 'শুকুর' সামাজিকতা ও শিষ্টাচারের নিদর্শন। পক্ষান্তরে, হঠাৎ আঘাত পাইলে আমরা উহ্ করিয়া উঠি—চিন্তাভাবনার অবকাশ পাই না ; ঠিক তেমনি আবার মধ্যরাত্রে নিদ্রাভংগের পর সহসা বাতায়নপথে পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়া চিন্তা-ভাবনা না করিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠি, কি চমৎকার ! 'হাম্দ'ও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অনুরূপ স্বতঃস্ফূর্ত আত্ম-নিবেদনমূলক প্রশংসা।

'রব্' আর একটি সারগর্ভ অননুবাদ্য আরবী শব্দ। কুরআনুল করীমের অনুবাদকেরা এই আরবী শব্দটির অনুবাদ ইংরেজীতে 'লর্ড' এবং বাংলায় 'প্রভু' দ্বারা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ 'পালনকর্তা' শব্দটিও ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের কোনটির দ্বারাই 'রব্' শব্দটির পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং 'রব্' শব্দটির অনুবাদের প্রয়াস না পাইয়া কলম ও কিতাবের মত উহাকেও বাংলা ভাষায় ব্যবহার করিয়া ভাষাকে সমৃদ্ধ করা উচিত। মূলতঃ 'রব্' শব্দটির তিনটি অর্থ আছে ঃ প্রথম অর্থ স্রষ্টা, দ্বিতীয় অর্থ পালনকর্তা এবং তৃতীয় অর্থ বিবর্তনকারী। 'রব্' আল্লাহ্ তাআলার اسم صفت অর্থাৎ গুণবাচক নাম। আবদুল হামিদ নামক কোন ব্যক্তি যদি একজন চিকিৎসক হন, তবে তাহার 'ডাক্তার সাহেব' নামটি হইবে গুণবাচক নাম—আবদুল হামিদের পূর্ণ সত্তার পূর্ণ পরিচয় উক্ত নামের দ্বারা পাওয়া যায় না, কেবল তাহার বিশেষ একটি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। যে নাম কোন সত্তার পূর্ণ

পরিচয় ধারণ করে, উহাকে বলা হয় اسم ذات 'ইস্মে জাত'। আবদুল হামিদ উক্ত ব্যক্তির 'ইস্মে জাত' এবং 'ডাক্তার সাহেব' তাহার 'ইসমে সিফাত'। আল্লাহ্ শব্দটি ইলাহীর 'ইসমে জাত' এবং 'রব' শব্দটি 'ইসমে সিফাত'। কুরআনুল করীমের ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ্‌র এই 'ইসমে জাত' ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ বিশেষ 'ইসমে সিফাত' ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এক স্থানে কেন 'ইস্মে জাত' এবং অন্য স্থানে কেন একটি বিশেষ 'ইস্মে সিফাত' ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে না পারিলে কুরআনুল করীমের বাণীর পরিচ্ছন্ন ধারণা উপলব্ধি করা সম্ভব নহে।

আল্লাহ্ সসীম নহেন, তিনি অসীম। তবে তাঁহার অসীমত্ব স্থানবাচক (Spacial) নহে, গুণবাচক—কারণ, স্থান (Space) সসীম। আল্লাহ্ তাআলার صفت বা গুণ অসীম এবং তিনি ইচ্ছামত নিজের যে-কোন গুণ সৃষ্টি করিতে পারেন। আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণ সত্তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান অথবা তাঁহার অসীম গুণাবলীর প্রত্যক্ষ পরিচয় সম্ভব নহে; কারণ, মানুষের জ্ঞান ও জ্ঞানলাভের শক্তি অপরিসীম হওয়া সত্ত্বেও অসীম নহে। এই কারণে আল্লাহ্ তাআলা কুরআনুল করীমে বলেন لن ترانى 'তুমি আমাকে কখনোই দেখিবে না'। আল্লাহ্ তাআলার অসীম গুণাবলীর কণামাত্রের পরিচয় আমরা পাই তাঁহার সৃষ্ট আমাদের এই বিশ্ব-জগতে। মহাবিশ্বের সহিত সংশ্লিষ্ট গুণাবলীর মধ্যে যে-গুণ মহাবিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, গতি ও পরিবর্তন তথা বিবর্তনের কারণ, সেই গুণের পরিচায়ক আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নাম 'রব'। যিনি অণু-পরমাণু কিংবা আমাদের অজ্ঞাত আরও সূক্ষ্মতর কোন আদি সৃষ্টি হইতে চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারকাশোভিত বিস্ময়কর এই বিরাট বিপুল বিশ্বের স্রষ্টা, যিনি এই বিশ্বজগতের প্রতিটি নির্জীব ও সজীবের পালনকর্তা এবং তাহাদের প্রাথমিক অবস্থা হইতে চরম বিকাশের নিয়ন্তা, তাঁহারই এই সকল গুণের গুণবাচক নাম 'রব'।

আল্-ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতে-করীমায় আল্লাহ তাআলার আরো দুইটি গুণবাচক নাম 'রহমান' ও 'রহীম' উল্লিখিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তাআলা 'রহমান' ও 'রহীম'। এই দুইটি শব্দও অনুবাদের চেষ্টা না করিয়া মূল শব্দদ্বয়ের ব্যবহার দ্বারা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করা উচিত। কেননা, এই দুইটি সারগর্ভ শব্দও অন্য ভাষায় অননুবাদ্য। ইহারা প্রথম আয়াতে-করীমায় উল্লিখিত গুণবাচক শব্দ 'রব'-এর পরিপূরক। জীব মাত্রেরই আলো বাতাস প্রভৃতি এমন কতকগুলি বস্তুর প্রয়োজন, যাহা তাহার জীবন ধারণের জন্য অপরি-

হার্য; অথচ সেগুলি সৃষ্টি করা তাহার সাধ্যাতীত। এইরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অপার করুণায় কোন্ জীবের কখন কোন্ বস্তুর প্রয়োজন হইবে—যাহা তাহার জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য অথচ যাহা সে আপন প্রচেষ্টায় অর্জন করিতে অক্ষম—তাহা পূর্বাহ্নে স্থির করিয়া কর্ম-প্রচেষ্টা-নিরপেক্ষভাবে সকলকে সরবরাহ করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সংগে সংগে তাহার জীবন ধারণের জন্য স্তনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু এই স্তন এমন একটি বস্তু যাহা সদ্যজাত শিশু স্বীয় প্রচেষ্টায় সৃষ্টি করিতে পারে না, অথচ উহা তাহার জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ্ তাআলার এই সকল দান সার্বিক ও কর্ম-নিরপেক্ষ। মু'মিন-কাফির, পণ্ডিত-জাহিল নির্বিশেষে সকলের প্রতিই রাব্বুল আলামীনের এই দান সমভাবে বিতরিত হয়। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্ তাআলা যাবতীয় রহমতের মত এই দানগুলির প্রতিদানেও কোন কিছুই প্রত্যাশা করেন না; পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই প্রকারের আয়াস-নিরপেক্ষ দান যাহারা স্বীকার করেন এবং যাহারা অস্বীকার করেন, সকলেই সমভাবে এগুলি ভোগ করিয়া থাকেন। রাব্বুল আলামীনের এই চারিটি গুণের সমন্বয়ই হইতেছে আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নাম 'রহমান'। অন্যান্য জীবের মত মানুষেরও উল্লিখিতরূপ জৈবিক প্রয়োজন আছে। তাহা ছাড়া মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে অনুরূপ বিশেষ প্রয়োজনও রহিয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কুরআনুল করীম হইতেছে মানুষের অনুরূপ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত আয়াস-নিরপেক্ষ ঐশী দান। এই কারণেই মানুষকে কুরআন শিক্ষা দানের প্রসংগে বলা হইয়াছে: আর-রহমান কুরআন শিক্ষা দিয়াছেন; কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলার 'ইসমে জাত' বা অন্য কোন 'ইসমে সিফাতের' পরিবর্তে আর্-রহমান নাম ব্যবহারের ইহাই তাৎপর্য।

'আর্-রহীম' আল্লাহ্ তাআলার আর একটি গুণবাচক নাম। জীব আর্-রহমানের নিকট হইতে স্বীয় প্রয়োজনে আয়াস-নিরপেক্ষ দান লাভ করিয়া সেগুলির সদ্ব্যবহারের দ্বারা আল্লাহ্‌র রহমতে নিজ কর্মফল লাভ করে। রাব্বুল আলামীনের যে-গুণ জীবকে তাহার কর্মের জন্য আপন রহমত-সিঞ্চিত-ফলাফল দান করে, আল্লাহ্ তাআলার সেই গুণ-প্রকাশক নাম 'রহীম'। আর্-রহমানের দান কর্ম-নিরপেক্ষ এবং আর্-রহীমের দান কর্ম-সাপেক্ষ।

আল-ফাতিহার তৃতীয় আয়াতে করীমায় বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তাআলা দ্বীন-দিবসের মালিক। মালিক শব্দটি বাংলা ভাষায় প্রচলিত

আছে। আল্লাহ তাআলার মালিকানা কোনরূপে শর্তাধীন নহে, সার্বভৌম। دين এই আরবী শব্দটির গূঢ় অর্থ কুরআনুল করীমেই রহিয়াছে। দ্বীন সম্পর্কে কুরআনুল করীম বলেন, فطرت الله التى فطر الناس عليها "উহা আল্লাহ্‌র ফিতরাত, যাহার ভিত্তিতে মানুষের ফিতরাত বা প্রকৃতি গঠন করা হইয়াছে।" (৩০ঃ ৩০) সুতরাং স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে, মানুষের প্রকৃতিই মানুষের দ্বীন। অন্যান্য জড় ও জীবসত্তার দ্বীন হইতে মানুষের দ্বীনের পার্থক্য এই যে, নিজের দ্বীন তথা প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে দিয়াছেন। সে স্বাধীনতার অপব্যবহার দ্বারা মানুষ নিজের নশ্বর ও অবিনশ্বর সত্তার ক্ষতি সাধন করে। কুরআনুল করীম মানুষকে তাহার সনাতন প্রকৃতির সহিত পরিচিত করে এবং মানব-প্রকৃতির সহিত সুসমঞ্জস এক জীবন-ব্যবস্থার বিধান দেয়। এই জীবন-ব্যবস্থায় মানুষ তাহার স্রষ্টার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তথা নিজের সনাতন প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করিয়া তাহার সহিত শান্তি স্থাপন করিয়া স্রষ্টার মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সফল করে। এই কারণেই কুরআনুল করীমে মানুষের দ্বীনকে اسلام ইসলাম (আত্মসমর্পণ ও শান্তি) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا ـ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাংগ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকেই তোমাদের জন্য দ্বীন নির্দিষ্ট করিলাম।"

মানুষের জৈবিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা তথা তাহার নশ্বর ও অবিনশ্বর সত্তা অর্থাৎ পার্থিব ও পারত্রিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের দ্বীন অর্থাৎ প্রকৃতির ভিত্তিতে। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাত, উভয় কালের জীবনই দ্বীনের আওতাভুক্ত। সাধারণতঃ দ্বীন শব্দটির অপব্যবহারের দ্বারাই দ্বীনের প্রকৃত তাৎপর্যকে ক্ষুন্ন করা হইয়া থাকে। সচরাচর আমরা বলিয়া থাকি, তোমার দ্বীন-দুনিয়ার মংগল হউক। এ কথার অবশ্যম্ভাবী বুদ্ধি-বৃত্তিক প্রতিক্রিয়া এই যে, দ্বীন ও দুনিয়া পরস্পর হইতে পৃথক। কুরআনুল করীম আমাদিগকে 'দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ হউক' এরূপ প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দেন না; কুরআনুল করীম প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দেন, "হে আমাদের রব, দুনিয়ায় ও

আখিরাতে আমাদিগকে কল্যাণ দান করুন' এবং এই প্রার্থনাই আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যহ প্রতি সালাত-অন্তে পেশ করিয়া থাকি। দ্বীন শব্দটির পূর্বোক্ত অপব্যবহারের দ্বারা এই ধারণা সৃষ্টি করা হইতেছে যে, দ্বীনের ও দুনিয়ার আমল তথা আখিরাত ও দুনিয়ার আমল দুইটি পৃথক পৃথক পর্যায়ভুক্ত। এই কারণেই মিথ্যাবাদী ও চৌর্যবৃত্তিতে রত ব্যক্তি নামাজ পড়িয়া ভাবিতেছে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়া ও চুরি করিয়া দুনিয়ার জিন্দেগী সমৃদ্ধ করিল এবং নামাজ পড়িয়া আখিরাতের পাথেয় অর্জন করিল। দ্বীনের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করিলে সে জানিত যে, মিথ্যা ও চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় লইয়া সে সালাতের রূহ্‌কে হত্যা করিল এবং তদ্দ্বারা সে নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের জিন্দেগীকে সমানভাবেই কলুষিত করিল। আল্-কুরআন মানুষকে তাহার দ্বীন অর্থাৎ প্রকৃতি-ভিত্তিক জীবন-ব্যবস্থার বিধান দিয়া এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, ইসলামকে অস্বীকার করার অর্থ নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁহার অপার করুণায় মানুষকে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা দান করিয়া যে অপরিসীম সম্ভাবনায় ভূষিত করিয়াছেন, তাহার অপব্যবহার দ্বারা মানুষ নিজ প্রকৃতিবিরোধী কার্যক্রমে লিপ্ত হইয়া 'আসফালুস সাফিলীন'-এ পরিণত হয় অর্থাৎ হীনতার চরমত্ব প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্‌র বিধান-প্রকৃতি অমোঘ; প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে তাহার অনিবার্য পরিণতি হইতে দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জীবনেই কাহারো পরিত্রাণ নাই। পার্থিব জীবনের অহর্নিশির ক্ষয়-ক্ষতি সাধারণ দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত না হইলেও প্রতিটি অপকর্মের সংগে সংগেই উহা আপন ক্রিয়া করিয়া থাকে। মানুষের কর্মের লাভ-ক্ষতির পূর্ণ হিসাব-নিকাশ (Balance sheet) তাহার মৃত্যুর পরেই সম্ভব: কিন্তু এই চরম হিসাব-নিকাশ তাহার দৈনন্দিন লাভ-লোকসানেরই যোগফল। দ্বীনের আনুগত্যের সুফল এবং দ্বীনদ্রোহিতার কুফল যে-যে মুহূর্তে দুনিয়ায় ও আখিরাতে বিচ্ছিন্ন বা সম্মিলিতভাবে প্রতিফলিত হয় তাহাদের প্রতিটিই ইয়াওমুদ্দ্বীন। মানুষের আখিরাত তাহার দৈনন্দিন মুহূর্তিক কর্মফল এবং জীবনের সামগ্রিক কর্মফলের উপরই নির্ভর করে। মৃত্যুর পরে আখিরাতে ইহজীবনের কর্মফলের চরম ইয়াওমুদ্দ্বীন। সুতরাং ইয়াওমুদ্দ্বীনের সহজ অর্থ কর্মফল। অতএব এই আয়াতে-করীমায় বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কর্মফলের মালিক। মানুষের সীমিত বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা চালিত কর্মাধিকারে মানুষ কখনও মুক্তি পাইতে পারে না; বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে আকরম (দঃ) একদা এ-কথাই

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল, আপনিও কি আপনার কর্মাধিকারে মুক্তি পাইবেন না ?' উত্তরে রসূলে করীম (দঃ) বলেন, "না আল্লাহ্‌র রহমত ব্যতীত কাহারও মুক্তি নাই।" সুতরাং ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এ আয়াতে-করীমায় কুরআনুল করীম বলিতেছেন ঃ আল্লাহ্--যিনি মহাবিশ্বের রব, রহমান ও রহীম তিনিই কর্মফলের মালিক।

আল্-ফাতিহার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন, "সকল হাম্‌দ্ আল্লাহ্‌র" যিনি মহাবিশ্বের রব, রহমান, রহীম ও দ্বীন-দিবসের মালিক। 'সকল হাম্‌দ্ আল্লাহ্‌র', এই উক্তি গভীর তাৎপর্য-পূর্ণ। যে সকল মনোভংগি মানব-জীবনের ব্যর্থতার কারণ তন্মধ্যে অহংকার ও হীনমন্যতাই সর্বাধিক ধ্বংসকারী। বিভিন্ন স্থানে কুরআনুল করীম ইহাও ঘোষণা করেন যে, "লিল্লাহিল হাম্‌দ্" অর্থাৎ হাম্‌দ্‌ই আল্লাহ্‌র। একথার নির্গলিতার্থ এই যে সকল হাম্‌দ্ আল্লাহ্‌র, কেবল ইহাই সত্য নহে, শুধু হাম্‌দ্‌ই তাঁহার প্রাপ্য--হাম্‌দ্ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই জ্ঞান মানুষকে একাধারে অহংকার এবং হীনমন্যতা হইতে রক্ষা করে। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় পরিদৃষ্ট হয় যে, জীবনের সাফল্যে মানুষের অহম-সত্তা প্রবল হয় এবং সে মনে করে যে তাহার সাফল্য একান্তভাবেই আপন পুরুষকারের ফল। অন্যদিকে ব্যর্থতার জন্য মানুষ অদৃষ্টকেই দায়ী করে। ফলে, সাধারণতঃ সাফল্যে মানুষ অহংকারে আত্ম-গৌরবে মোহাচ্ছন্ন থাকে এবং ব্যর্থতায় নিজের মধ্যে ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া অদৃষ্টকে দোষারোপ করে। আল্-ফাতিহার প্রথম আয়াতাংশেই কুরআনুল করীম বলেন, মানুষের অহংকার বা হীনমন্যতার কোন সংগত কারণ নাই। কেননা, আল্লাহ্ তাআলাই সকল কর্মফলের মালিক এবং তাঁহার করুণা ব্যতিরেকে কোন কার্যেই সাফল্য লাভ সম্ভব নহে। এতদ্ব্যতীত, মানুষের কর্মশক্তিও আল্লাহ্-প্রদত্ত। সুতরাং সাফল্যের জন্য অহংকার নহে, আল্লাহ্‌র হাম্‌দ্‌ই ন্যায়-যুক্তিসংগত। এই বিশ্বাস যাহার অন্তরে সজীব ও সক্রিয় সে কখনও অহংকারী হইতে পারে না। এ কারণে মু'মিন মাত্রেই সকল কার্য আরম্ভ করেন 'বিসমিল্লাহ্' এবং সমাপ্ত করেন 'আল্-হাম্‌দুলিল্লাহ্' বলিয়া। মু'মিনের অন্তরে ব্যর্থতায় নৈরাশ্য ও হীনমন্যতার সঞ্চার হইতে পারে না ; কেননা, স্বয়ং আল্লাহ্‌ই তাহার রব্। সাধারণতঃ পরিদৃষ্ট হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠাবান ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যদি কাহারও ভাল-মন্দের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তবে আশ্রিত ব্যক্তির চিত্তে নিরাপত্তা-

বোধের সঞ্চার হয়। আশ্রয়দাতার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতার পরিধি যতই প্রসারিত হয় আশ্রিতের অন্তরের নিরাপত্তাবোধও সেই অনুপাতে গভীর হয়। এভাবে যদি কোন দেশের রাষ্ট্রশক্তি কাহাকেও আশ্রয় দান করিয়া তাহার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে আশ্রিত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র-সীমায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতে পারে। এমতাবস্থায় কেহ যদি সক্রিয়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মহাবিশ্বের রব্বুই তাঁহার নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তবে সে ব্যক্তির চিত্ত হইবে নির্ভীক ও সর্বপ্রকার নৈরাশ্যমুক্ত। সকল হাম্দ্ আল্লাহ্‌র—এই একটিমাত্র সহজ-সরল বাক্যের দ্বারা কুরআনুল করীম সুখে-দুঃখে, সাফল্যে-ব্যর্থতায়, সর্বাবস্থায়ই চিত্তের সাম্যভাব রক্ষা করিতে শিক্ষা দিতেছেন। এইরূপ সর্বাবস্থায় নির্বিকার চিত্তকেই কুরআনুল করীমে 'আন্-নাফ্সুল মুৎমায়িন্না' তৃপ্ত-শান্ত চিত্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব 'সকল হাম্দ্ আল্লাহ্‌র' এ বাক্যের ব্যবহারিক অর্থ হইতেছে : চিত্তকে বিকার-মুক্ত করিতে হইবে; মানুষ কর্ম করিবে, কিন্তু কর্মফলের দ্বারা তাহার চিত্ত স্ফীত বা সংকুচিত হইবে না। তাসাউফ এবং যোগশাস্ত্রেরও প্রথম এবং শেষ শিক্ষা ইহাই। বিকার-মুক্ত চিত্ত কেবল অনাবিল আনন্দের আধারই নহে, ইহা জ্ঞান এবং জ্ঞান-প্রসূত শক্তিরও উৎস। পক্ষান্তরে ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত বাত্যাতাড়িত তৃণের ন্যায় অসহায়। সুতরাং মানুষকে তাহার ঈপ্সিত গৌরবোজ্জ্বল জীবন লাভ করিতে হইলে নিজের চিত্তকে এরূপ প্রশান্ত করিতে হইবে, যাহা হইতে অবস্থা নির্বিশেষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্‌র হাম্দ্ ধ্বনিত হয়।

আল্লাহ্ তাআলা মহাবিশ্বের রব্ এ বাক্যাংশে স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তাআলা মহাবিশ্বের তথা মানুষের স্রষ্টা, পালক ও বিবর্তক। মানুষকে তিনি সর্বোত্তম ছাঁচে এবং অপরিসীম সম্ভাবনার আধার করিয়া গড়িয়াছেন। কিন্তু কর্মদোষে সে নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করিতে হইলে এবং ইহকাল ও পরকাল-বিস্তৃত অনন্ত জীবনের অপরিসীম সম্ভাবনার দিকে নিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইলে, ইহজীবনে একদিকে যেমন দেহ-মনকে সুস্থ রাখিবার জন্য পানীয়, আহার্য প্রভৃতি বস্তু-সম্পদের প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি জীবনের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভংগি লাভের জন্যও প্রয়োজন বিশুদ্ধ জ্ঞানের। রাব্বুল আলামীন কুরআনুল করীমের মাধ্যমে মানুষকে সেই জ্ঞান দান করিয়াছেন। কুরআনুল করীম নির্দেশিত

সৎকর্মগুলি মানুষের সাবলীল অগ্রগতির সহায়ক এবং উহাতে যে কর্মগুলিকে মন্দ বলা হইয়াছে সেগুলি সেই অগ্রগতির পরিপন্থী। যিনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার রব্, জীবনের সর্বাবস্থায় সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তির সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়া নিজেকে আল্লাহ-নির্দেশিত জীবনপথে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে তিনি সদা সচেষ্ট থাকেন। সুতরাং আল্লাহ্ মহাবিশ্বের রব্—এই জ্ঞানের দ্বারা কুরআনুল করীম মানুষকে তাঁহার রবের পালন-নীতির জ্ঞান-অর্জন এবং সেই জ্ঞানালোকে নিজ জীবন গঠনের শিক্ষা দিতেছেন। এ সম্পর্কিত মৌল জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলা ওয়াহীর মাধ্যমে মানুষকে দিয়াছেন। সেই মৌল জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া মানুষ আপন বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করিতে সক্ষম।

সকল হাম্‌দ্ মহাবিশ্বের রব আল্লাহ্‌র—এই বাক্যের দ্বারা কুরআনুল করীম এ শিক্ষাও দিতেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা সকলের রব বলিয়াই তিনি সকল হাম্‌দের অধিকারী; সেইরূপ অহম সত্তার পূজারী না হইয়া ভূমা-সত্তার উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেই কেবল মানুষ অন্যের প্রশংসার্হ হইতে পারে। রব্ শব্দটি দ্বারা সংকীর্ণতম ও সাধারণ্যে প্রচলিত অর্থে বুঝায় লালন-পালন, যথা—বুভুক্ষুকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান ইত্যাদি। মানুষের উত্থান-পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে ব্যক্তি বা জাতির মধ্যে এই গুণের প্রাবল্য থাকে সেই ব্যক্তি বা জাতি বিশ্বে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়। ভূমা-সত্তার প্রাধান্যে ব্যক্তি সমষ্টির সহিত নিজের একাত্মতা উপলব্ধি করে। ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির একাত্মতাবোধ ব্যক্তির সমষ্টি জাতীয় জীবনের সমাজ-সংহতিকে সুদৃঢ় করে। আর যেহেতু সমাজ-সংহতিই জাতির প্রাণ-শক্তি, তাই সুদৃঢ় সংহতির প্রাবল্যে সমগ্র জাতিই লাভ করে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি, সম্মান ও মর্যাদা। পক্ষান্তরে, ব্যক্তি-জীবনে যখন অহম-সত্তার প্রাধান্য দেখা দেয়, সহস্রমুখী প্রাচুর্যের মধ্যেও আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দেখা দেয় সংঘর্ষ; ফলে, দুর্বল হয় সমাজ-সংহতি আর জাতির ললাটে নামিয়া আসে দুর্দশা ও দুর্যোগের অমানিশা। ভূমা-সত্তার প্রাধান্যে ব্যক্তি যখন সকলের মাঝে নিজেকে দেখিয়া সকলকে আপনার করিয়া লয় তখন সেও অন্যান্যদের নিকট হইতে লাভ করে স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা ও শ্রদ্ধা; সকলেই তাহাকে বরণ করিয়া লয় একান্ত আপনার জন রূপে। ইয়েমেনের যুবরাজ হাতিম তায়ী এবং বাংলার ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মুহম্মদ মুহসিন এ পথেই মানুষের অন্তরে অটল আসন অধিকার করিয়া আছেন। এই ভূমা-সত্তার প্রাধান্যগুণে গুণান্বিত

হইয়াই ইসলামের প্রাথমিক যুগের বেদুঈন আরবেরা এখনও বিশ্বের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিতেছেন।

সকল হাম্‌দ্‌ মহাবিশ্বের রব আল্লাহ্‌র—এই বাক্যটি দ্বারা কুরআনুল করীম আরও শিক্ষা দিতেছেন যে মু'মিনের কর্তব্য হইতেছে, মানুষের মধ্যেও যাহারা তাহার মুহসিন বা উপকারী, তাহাদের ইহ্‌সান বা উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। রসূলে করীম (দঃ) বলিয়াছেন, "যে-ব্যক্তি মানুষের ইহ্‌সান স্বীকার করে না সে আল্লাহ্‌র ইহ্‌সানও স্বীকার করিতে পারে না।" অর্থাৎ যে-ব্যক্তি তাহার দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে মানুষের উপকার স্বীকার করে না, সে সকল হাম্‌দ আল্লাহ্‌র—এ হাম্‌দ্‌-বাক্যও পরিপূর্ণ ও যথাযথ আন্তরিকতা সহকারে উচ্চারণ করিতে পারে না।

আল্লাহ্‌ তাআলা মহাবিশ্বের তথা মানুষের রব্‌, কেবল ইহাই আল্লাহ্‌র সহিত মানুষের সম্পর্কের পূর্ণ পরিচয় নয়। কুরআনুল করীমে আল্লাহ্‌ তাআলা ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, মানুষকে তিনি পৃথিবীতে তাঁহার 'ইসমে সিফাত' রব্‌-এর খলীফা বা প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়াছেন। সে দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালন করার জন্য মানুষকে তিনি তাঁহার উক্ত নামের পরিপূরক গুণাবলীতে বিভূষিত করিয়াছেন। রসূলে করীম (দঃ) শিক্ষা দিয়াছেন: تخلقوا باخلاق الله "নিজেকে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত কর"। যিনি সর্বান্তঃকরণে ও সক্রিয়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মহাবিশ্বের রব্‌ আল্লাহ্‌, এবং পৃথিবীতে তিনি আল্লাহ্‌র 'ইস্‌মে সিফাত' রব্‌-এর খলীফা, যিনি আন্তরিকতা সহকারে চেষ্টা করেন নিজেকে উক্ত গুণে গুণান্বিত করিয়া দৈনন্দিন জীবনকে সেই আদর্শে গঠন করিতে এবং সেই সংগে, অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্বপ্রকার উপকারের জন্য সকৃতজ্ঞ থাকিতে যিনি অভ্যস্ত, একমাত্র তাঁহারই চিত্ত বিকারমুক্ত ও তৃপ্ত-প্রশান্ত এবং একমাত্র তাঁহারই অন্তর হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হইতে পারে, সকল হাম্‌দ্‌ মহা-বিশ্বের রব্‌ আল্লাহ্‌র।

রহমান, রহীম ও দ্বীন-দিবসের মালিক—এই তিনটি গুণবাচক নাম দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষকে তাঁহার বিশ্বপালন পদ্ধতির মৌল নীতির মা'রেফাত অর্থাৎ জ্ঞান দান করিতেছেন। রহমান তাঁহার বিশ্ব-পালনের প্রতিদানে বিশ্বের নিকট কিছুই প্রত্যাশা করেন না: এ দান সার্বিক, কর্ম-চিন্তা-বিশ্বাস এবং প্রচেষ্টা-প্রয়াস নির্বিশেষে সকলেই সমভাবে ভোগের অধিকারী। আর-রহমানের এই অযাচিত দান-ব্যবহারের চেষ্টা ও শ্রমসাধ্য ফলাফল, আল্লাহ্‌ তাআলার যে গুণের প্রতীক, 'রহীম'

তাহারই মাধ্যমে মানুষকে দান করেন। শেষোক্তরূপে দানের ব্যাখ্যা প্রসংগেই কুরআনুল করীম বলেনঃ ليس للانسان الا ما سعى "মানুষ যাহার জন্য চেষ্টা করে তাহা ব্যতীত কিছুই তাহার প্রাপ্য নহে" (৫৩ঃ ৩৯); لا يكلف الله نفسا الا وسعها "আল্লাহ্ কোন আত্মার উপর তাহার সাধ্যাতীত কর্মভার আরোপ করেন না" এবং لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت "যে আত্মা যাহা উপার্জন করে তাহাই তাহার প্রাপ্য এবং সে তাহার নিজের কর্মের কুফলই ভোগ করে।" (২ঃ ২৮৬) মানুষের সম্ভাবনা অপরিসীম হওয়া সত্ত্বেও অসীম নহে; সীমিত জ্ঞান ও কর্মশক্তির উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া মানুষ বাঞ্ছিত ফল লাভে অক্ষম। কর্মফলের মালিক আল্লাহ্ তাআলা মানুষের নিয়ত ও সাধনার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার রহমত দ্বারা মানুষের কর্মকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। যে ভাগ্যবান আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং যিনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ মহাবিশ্বের রব্, রহমান, রহীম এবং দ্বীন-দিবসের মালিক, তাহার অন্তরকে ভয়-ভীতি দ্বিধা-সন্দেহ ও হীন-মন্যতা স্পর্শ করিতেও পারে না; তাহার চিত্ত স্বাভাবিকভাবেই হয় বিকার-মুক্ত ও তৃপ্ত-প্রশান্ত; এবং সে চিত্ত হইতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্র হাম্দ্ উচ্চারিত হয়। কুরআনুল করীম বলেনঃ كتب على نفسه الرحمة "তোমাদের রব্ রহমতকে নিজের কর্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন" (৬ঃ ১২) এবং 'তোমাদের মধ্যে কেহ যদি অজ্ঞতাবশতঃ অন্যায় কার্য করে ও পরে অনুতপ্ত হইয়া পুনরায় সৎকার্য করে তখন তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও রহীম।' আল্লাহ্র রহমতে আস্থাহীন হওয়া ও আল্লাহ্র অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হওয়া একই কথা।

যিনি বিশ্বাস করেন যে মানুষ দুনিয়ায় রাব্বুল আলামীনের খলীফা, খিলাফতের দায়িত্ব যোগ্যতার সহিত পালনে সক্ষম করিবার জন্যই মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার বিশ্ব-পালন নীতির সহিত সংশ্লিষ্ট গুণাবলীতে ভূষিত করিয়াছেন এবং যিনি বিশ্বাস করেন যে, দুনিয়ায় রাব্বুল আলামীনের খিলাফতের দায়িত্ব পালনই আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত দাসত্ব, তিনি ইহা সহজেই উপলব্ধি করিবেন যে, মানুষ হিসাবে তাহার দায়িত্ব রাব্বুল আলামীনের বিশ্ব-পালন-নীতির অনুসরণে নিজের ও অপর জীবের পালন করা। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার বিশ্বস্ত সাহাবীগণ যে সততা, নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সহিত এই দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন তাহাই ইসলামের প্রকৃত পরিচয়।

মানুষের যাবতীয় ক্রিয়া-কর্মের সুড়ান্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মানুষের কর্ম দেওয়া ও নেওয়া এই দুইটি ক্রিয়াতেই সীমিত। মানুষ তাহার কর্ম দ্বারা হয় কাহাকেও কিছু দেয়, না হয় কাহারও নিকট হইতে কিছু নেয়। কেহ বা বানিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে লাভ-ক্ষতির হিসাব কষিয়া দেওয়া-নেওয়া করিয়া থাকে, কেহ বা স্বার্থান্ধ হইয়া কেবল নেওয়াতেই আনন্দ পায়, আবার কেহ আনন্দ পায় দেওয়ার মধ্যে। কেহ বা গান গাহিয়া অন্যকে আনন্দ দান করে এবং বিনিময়ে বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিয়া শ্রোতার সহিত দেওয়া-নেওয়ার ব্যবসায় করে ; কেহ বা গায়কের গানে আনন্দ লাভ করিয়াও স্বীয় কর্তব্যজ্ঞানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিনিময়ে কিছুই প্রদান করে না—স্বার্থান্ধতার পরিচয় দেয় ; আবার কোন গায়ক গান গাহিয়া অন্যকে আনন্দ দানের বিনিময়ে কিছুই প্রত্যাশা করে না—গাওয়ার আনন্দেই গাহিয়া যায়। কেহ অপরকে বিদ্যা দান করে অর্থের বিনিময়ে, অপর কোন বিদ্যার বিনিময়ে বা বিদ্যার্থীর সেবার বিনিময়ে ; কেহ বা দানের মধ্যেই পায় তাহার পুরস্কার, গভীর আনন্দ। কেহ বা দেয় শ্রম, নেয় অর্থ ; কেহ বা দেয় অর্থ, নেয় শ্রম। এই লেন-দেনের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে জগতের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না, লালন-পালন ও শাসন-শোষণ তথা জীবনের সর্বপ্রকার ঘাত-সংঘাতের মূল। যাহার মধ্যে নেওয়া অপেক্ষা দেওয়ার প্রবণতা অধিক এবং না চাহিতে যাহা আসে তাহাতেই যিনি পরিতৃপ্ত তিনিই মহৎ ; যিনি ন্যায়নীতির ভিত্তিতে দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেন তিনিই ন্যায়-পরায়ণ ; এবং যাহার মধ্যে দেওয়া অপেক্ষা নেওয়ার প্রবণতাই অধিক, সে-ই অধম। রাব্বুল আলামীনের বিশ্বপালন-নীতির মূল তত্ত্ব এই যে, তিনি কেবল দানই করেন, কিছুই গ্রহণ করেন না ; তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে। সুতরাং রাব্বুল আলামীনের খলীফা মানুষের কর্তব্য নেওয়া অপেক্ষা দেওয়ার প্রবণতার উৎকর্ষ সাধন করা। এই মনোভংগি গঠনের উপরই বিশ্বের শান্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। এ মূল্য-বোধের ভিত্তিতে মানুষ যখন তাহার জীবন গড়ার প্রচেষ্টা করিবে তখনই দেওয়া-নেওয়া হইবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এবং সেই সংগে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের সর্বপর্যায়ে শাসন-শোষণের ঘটিবে অবলুপ্তি। যিনি মহা-বিশ্বের রব, তিনিই রহমান ও রহীম। সুতরাং মানুষেরও কর্তব্য এই দুই গুণের অনুশীলন করা। কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করার মধ্যে যথেষ্ট হীনতা আছে এবং সে হীনতা মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী। রাব্বুল আলামীনের খলীফা মানুষের কর্তব্য পরি-বার-পরিজন ও প্রতিবেশীর সহিত এরূপ একাত্ম সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত

থাকা যাহাতে সে তাহাদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূর্বাহ্নে উপলব্ধি করিয়া এবং কাহাকেও যাচঞা-রূপে হীনতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে না দিয়া সাধ্যমত সক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করিতে পারে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাব্বুল আলামীনের খলীফা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্যও এই নীতিরই সুষ্ঠু বাস্তবায়ন; অর্থাৎ প্রত্যেক কর্মক্ষম নর-নারীকে আপন আপন প্রতিভা ও রুচি মুতাবিক কর্মের মাধ্যমে জীবন বিকাশের জন্য অপরিহার্য উপাদানসমূহ, যথা—খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান সংস্থানের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দান করা এবং অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, শিশু প্রভৃতি যাহারা উক্ত উপাদানসমূহ সংস্থানের জন্য শ্রম দানে অক্ষম তাহাদের লালন-পালনের পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা। রহমানের দান চিন্তা-বিশ্বাস-কর্ম-নিরপেক্ষ ও সার্বিক; তাহাতে পাপ-পুণ্য বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন প্রশ্ন নাই। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা রহমান—ইহাতে বিশ্বাসী মু'মিনের কর্তব্য বর্ণ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বুভুক্ষুকে অন্ন দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান ও ভগ্ন-স্বাস্থ্যকে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করা।

'রহীম' রহমতের সহিত কর্মফল দান করেন। তাই, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য শ্রমের পূর্ণ মর্যাদা দান করা। এই ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন যাহাতে শ্রমিক তাহার শ্রমের যথাযথ পারিশ্রমিক হইতে বঞ্চিত না হয়; বরং এক্ষেত্রে নেওয়া অপেক্ষা দেওয়ার প্রতিই অধিকতর প্রবণতা থাকা প্রয়োজন। হযরত মুহম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাইবার পূর্বেই তাহার পারিশ্রমিক দিবে।" শ্রমের অমর্যাদা এবং শ্রমিকের বহুবিধ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহার শ্রম অপহরণই আমাদের এই রূপ-রসে-গন্ধে ভরা বসুন্ধরার কোটি কোটি নর-নারীর অশেষ দুঃখ-কষ্টের কারণ। 'রহীম' যে গুণের প্রতীক, বিশ্বমানব যেদিন সেই গুণের অধিকারী হইবে, "রণক্লান্ত" মানব সেদিন শান্ত হইবে এবং সেইদিনই আর—

> "উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না;
> অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।"

যতদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে নেওয়া-দেওয়ার ব্যাপারে রহমান ও রহীমের নীতি সক্রিয়ভাবে অনুসৃত না হইবে, ততদিন বিশ্ববাসীকে 'শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।'

কোন একটি কর্মফল কেবল কোন একটি বিশেষ কর্ম-পদ্ধতিরই ফল নহে; উহা বহু জানা-অজানা কার্য-কারণের ফল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা

যাইতে পারে, একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে বারুদে দেশলাই-কাঠি ঘর্ষণ করাই আগুন জ্বলিবার কারণ; কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ইহা অজানা নহে যে, বায়ুতে অক্সিজেন গ্যাসের অস্তিত্ব না থাকিলে অনুরূপ সহস্র ঘর্ষণেও আলো জ্বলিবে না। অর্থাৎ বারুদে দেশলাই-কাঠি ঘর্ষণই আগুন জ্বলিবার একমাত্র কারণ নহে, বাতাসে অক্সিজেনের অস্তিত্বও উহার অন্যতম কারণ। এইভাবে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের কাছেও উচ্চস্তরের কর্মফলের বহু কারণ অজ্ঞাত। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি সীমিত এবং তাহার কার্যকারণের জ্ঞান ক্রমবর্ধমান হওয়া সত্ত্বেও কোনো দিনই বিচ্যুতিহীন নহে। ঈপ্সিত কর্মফলের জন্য কেবল কর্মের উপরই নির্ভর করিতে হইলে মানুষ কখনই তাহা পাইত না। আল্লাহ্ তা'আলা ইহ-জীবনে ও পরজীবনেও মানুষের কর্মফলের মালিক। মানুষের কর্ম-নিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি তাঁর রহমত দ্বারা মানুষের ঈপ্সিত কর্মফল লাভের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার রহমতের দ্বারা মানুষের জীবনকে সহজ ও সরল করিয়া দিয়াছেন; মোহান্ধ মানুষ নিজেই নিজের জীবনকে জটিল ও বিপদসংকুল করিয়াছে। মানুষ যদি সক্রিয়ভাবে বিশ্বাস করিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা মহাবিশ্বের রব, রহমান, রহীম ও দ্বীন-দিবসের মালিক, তবে সেও জীবন-ক্ষেত্রে মুক্ত বিহংগের মত পাখা মেলিয়া অনাবিল আনন্দে বিচরণ করিতে পারিত এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই তাহার অন্তর নিরন্তর উপলব্ধি করিত, সকল হাম্‌দ্ আল্লাহ্‌র।

২.

মানবিক মর্যাদার চরমতম বাণী, "আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং একমাত্র তোমার সাহায্য যাচ্ঞা করি।" এই সারগর্ভ বাণীর অন্তর্নিহিত মূল শিক্ষা তিনটি: তওহীদ, সৃষ্টিতে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশ্ব-মানবের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। কুরআনুল করীম ত্রিশ খণ্ডে বিস্তৃত-ভাবে এই শিক্ষারই তাত্ত্বিক (Theoretical) ও প্রায়োগিক (Practical) ব্যাখ্যা করেন। ইসলামের অধ্যাত্মবাদ ও সমাজ-বিজ্ঞান তথা দর্শন, রাজ-নীতি, পারিবারিক ও সামাজিক বিধান; এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃ-তিক দৃষ্টিভংগির ইহাই মূল ভিত্তি। এই শিক্ষাকে সহজবোধ্য করার জন্য কুরআনুল করীম বার বার নানাভাবে উহার উল্লেখ করেন এবং এই কারণেই কুরআন পাঠ করিয়া অনেকের মনে হয় যে, উহা একই কথার নিষ্প্রয়োজন পুনরাবৃত্তিতে পূর্ণ। যাহাদের দৃষ্টি

জ্ঞানের বাহিরাবরণেই সীমিত, তাহাদের এইরূপ ধারণা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। বটবৃক্ষের বীজ অতি সূক্ষ্ম ; কিন্তু বিশালকায় বটবৃক্ষ, তাহার বিরাট কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বীজেরই পরিদৃশ্যমান ব্যাখ্যা। যে ব্যক্তির নিকট বটবৃক্ষের বীজ সুপরিচিত, উহা দেখিবামাত্র তাহার মানস চক্ষে বটবৃক্ষের বিপুল আকৃতি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে ; কিন্তু যিনি উহার সহিত আদৌ পরিচিত নহেন, বটবৃক্ষের ধারণা অর্জনের জন্য তাহার প্রয়োজন একটি পূর্ণাংগ বটবৃক্ষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

তৌহীদ ঐশীবাদের ইসলামী ধারণা। ঐশীবাদের কোন সর্বজন-স্বীকৃত ধারণা নাই। বেদান্তের 'অহম ব্রহ্মাস্মী' অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ, তাহার যৌক্তিক পরিণতি 'তত্বমসী' অর্থাৎ সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism), সাংখ্য বহুত্ববাদ, প্রতীকবাদ **Anthropomorphism** প্রভৃতি বহু প্রকার ধারণা আজিও সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান। তৌহীদ কেবল আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বই ঘোষণা করে না, আল্লাহ্‌র এককত্ব (Uniqueness) ঘোষণা করে। আল্লাহ্ কেবল ওয়াহিদ নহেন, তিনি আহাদ। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাঁহার সত্তা হইতে অপর কোন সত্তা উদ্ভূত নহে। তিনি অতুল, তাঁহার সমতুল্য অপর কোন সত্তা নাই। তাঁহার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ কোন অস্তিত্ব সৃষ্টির নাই, একথা সত্য ; কিন্তু সৃষ্টিও বাস্তব, ইহা মায়াও নহে এবং আল্লাহ্‌র সত্তাজাতও নহে। যখন কোন কারণে একটি মূল সত্তার এক অংশ তাহার মূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অপর একটি পূর্ণ সত্তা প্রাপ্ত হয়, জৈবিক অর্থে তখনই বলা হয় মূল সত্তাটি নতুন সত্তাটির জনক। এই অর্থে আল্লাহ্ কিছুরই জনক নহেন এবং তিনিও কোন কিছুর জাত নহেন। কুরআনুল করীমের সূরা ইখ্‌লাসের আয়াতে-করীমা لم يلد و لم يولد-এর ইহাই প্রকৃত অর্থ। এই তত্ত্ব দ্বারা ইহাও অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কোন জীবাত্মাই কোন দিন আল্লাহ্‌র সত্তার মধ্যে বিলীন হইয়া তাঁহার সহিত একাত্ম হইবে না। তাসাউফ অর্থাৎ ইসলামের বিশুদ্ধ অধ্যাত্মবাদের 'ফানা ফিল্লাহি' দ্বারা একথা বুঝায় না যে, মানবাত্মা পরমাত্মার সহিত একাত্ম হইবে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌র নিকট একাগ্র আত্ম-নিবেদনের সাধনার ফলে পুণ্যাত্মা নিজ ব্যক্তি-সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারে, যাহাতে তাঁহার জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, অনুভূতি ও ধী-শক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই ইচ্ছায় পরিচালিত হয়।

'কুফ্র্' অর্থাৎ আল্লাহ্র অস্তিত্বে সরাসরি অবিশ্বাস এবং শির্ক্ অর্থাৎ অংশীবাদ তৌহীদের পরিপন্থী। যুগ-যুগান্তের ঐতিহ্যের প্রভাবেই হউক, অথবা অবচেতনার নিভৃতে সহজাত ধারণার অবস্থিতি-তেই হউক, আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট, বিশুদ্ধ অথবা বিমিশ্র একটি ধারণা মানব মাত্রেরই আছে। সুতরাং অবিমিশ্র তৌহীদবাদে বিশ্বাসী হওয়া যেমন কঠিন, খাঁটি অবিশ্বাসী হওয়াও তেমনি কঠিন। মু'মিন হওয়ার জন্য চিত্তের যে নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার প্রয়োজন, কাফির হওয়ার জন্যও তাহাই প্রয়োজন। এইজন্য মু'মিন ও কাফিরের মধ্যবর্তী ব্যবধান অতি সূক্ষ্ম এবং এই কারণেই প্রকৃত কাফির মুশ্রিক অপেক্ষা মু'মিনের নিকটতর। সত্যসন্ধানী চিত্তের দৃষ্টিভংগির ঈষৎ পরিবর্তনই একজন কাফিরকে মুহূর্তে মু'মিন করিতে পারে। ইতিহাসখ্যাত আল্-ফারুক উমর ইবনুল খত্তাব ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মু'মিন ও কাফিরের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। সাধারণতঃ মানুষ মুশ্রিক অর্থাৎ অংশীবাদী এবং মুনাফিক অর্থাৎ কপট বিশ্বাসী। 'শির্ক' মানব-মনের এক মারাত্মক ব্যাধি এবং ইহাই সকল অনর্থের মূল। ইহা মানুষকে যাহা আপাত-মধুর তৎপ্রতি প্রলুব্ধ করে এবং তাহার পরিণাম দৃষ্টিকে করে অন্ধ।

শির্ক্ কেবলমাত্র মূর্তি-পূজাই নহে ; ইহার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। আমরা কেবল তোমারই দাসত্ব করি এবং একমাত্র তোমারই সাহায্য যাচঞা করি—একথার পরিষ্কার অর্থ বিশ্ব-প্রকৃতিতে, কুরআনুল করীমে ও সুন্নাহ্য় আল্লাহ্র যে ইচ্ছা অভিব্যক্ত, তাহারই নিকট সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করা এবং তাহার বিরোধী কোন-কিছুর নিকট নতি স্বীকার না করা। নেশায় বুঁদ মোগল সম্রাট জাহাংগীরের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় হজরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী শেখ আহমদ সির-হিন্দীকে। মোগল সম্রাটের ইচ্ছাই ছিল সে যুগে আইন; এবং তৎকালীন দরবারী আলিমেরা তাঁহাকে খেতাব দিয়াছিলেন জিল্লুল্লাহ্, অর্থাৎ আল্লাহ্র ছায়া। তাঁহার একটি ইংগিতই যে-কোন ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ডের জন্য যথেষ্ট ছিল। জাহাংগীরের সম্মুখে মুজাদ্দিদ মোগল দরবারের প্রথানুযায়ী কুর্নিশ না করিয়া উন্নত শিরেই দণ্ডায়মান হন। ইহাতে জনৈক দরবারী আলিম তাঁহাকে দরবারের রেওয়াজ স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন, 'জনাব, আপনি ত জানেন যে জান বাঁচানো ইসলামের শরিয়তে ফরজ।' উত্তরে মু'মিন মুজাদ্দিদ আল্ফেসানী বলেন, "শরীয়তের এ বিধান তোমার জন্য, আমার জন্য নহে। কুর্নিশ করা তো দূরের কথা, এ কম্বখত্ এখন নেশার হালে আছে—আমি ইহাকে সালামও করিব না।"

এইভাবে আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদিত চিত্তই শির্‌ক্-মুক্ত। শির্‌ক্-ব্যাধির উৎসস্থল চিত্ত। মানুষের কামনা-বাসনাই উহার লীলাক্ষেত্র। যদি কোন মূর্তিপূজককে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কেন সে স্বহস্তে নির্মিত মূর্তির পূজা করে, তবে উত্তরে সে বলিবে যে, সে পটপূজা করে না—ঘট-পূজা করে। অর্থাৎ সে এক ব্রহ্মেরই পূজা করে এবং তাহার সম্মুখস্থ দেব-মূর্তি ব্রহ্ম নহে, নিরাকার ব্রহ্মেরই সাকার প্রতীক মাত্র। যদি পুনরায় জিজ্ঞাসা করা যায়, "তোমার সম্মুখস্থ কালীমূর্তি কি ব্রহ্মের প্রতীক, অথবা ব্রহ্মের বিশেষ কোন একটি গুণের প্রতীক ?", সে বলিবে, "হ্যাঁ, এক-একটি দেব-দেবীর মূর্তি ব্রহ্মের এক একটি বিশেষ গুণের প্রতীক—কালী শক্তির প্রতীক, সরস্বতী বিদ্যার প্রতীক, লক্ষ্মী ধনের প্রতীক ইত্যাদি।" যদি আবার জিজ্ঞাসা করা হয়, "এ কথা কি সত্য যে, কালী-পূজার সময়ে তুমি ব্রহ্মের নিকট শক্তি যাচ্ঞা করো, সরস্বতী পূজায় যাচ্ঞা করো বিদ্যা এবং লক্ষ্মী-পূজায় ধন ?" সে বলিবে, "হ্যাঁ, ইহাই সত্য, প্রতীক-পূজার মাধ্যমে সেই একই ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা করি, 'দেহী শক্তি, দেহী বিদ্যা, দেহী ধন, দেহী সন্তান' প্রভৃতি।" পুনরায় যদি বলা হয়, "তবে কি এই মূর্তিগুলি বাস্তবিক এক ব্রহ্মের বিভিন্ন গুণের প্রতীক, অথবা তোমার ষড়রিপুগ্রস্ত চিত্তের বিভিন্ন কামনা-বাসনার প্রতীক, সেক্ষেত্রে জওয়াব কি হইবে ?" চূড়ান্ত পর্যালোচনায় মূর্তি-পূজা নিজের বাসনা-কামনার পূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং বাসনা-কামনার পূজাই শির্‌ক্, এবং শির্‌ক্ মানব-মনের সর্বাধিক মারাত্মক ব্যাধি। ইহা মানুষের বিরাট বিপুল অপরিসীম সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিয়া তাহাকে সকল নিকৃষ্টের নিকৃষ্টে পরিণত করে। মানুষ শির্‌ক্ করিলে আল্লাহ্ তাআলার কিছুই আসে যায় না—ক্ষতি হয় মানুষের নিজেরই। মোগল সম্রাট আকবর ফতেহ-পুর সিক্রীর দিওয়ান-ই-খাস-এ সমাসীন। তাঁহার দক্ষিণে বামে নব-রত্নের একেকটি রত্ন আবুল ফজল, ফৈজী, তানসেন, তোদরমল, মানসিংহ প্রভৃতি। সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইল একটি ছোট বালক। সম্রাট আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা, কি চাও।" খোকা বলিল, "আমি বাজারে একটি সুন্দর পুতুল দেখিয়াছি, সেইটি চাই।" খোকা যাহা চাহিল, তাহাই পাইল। শিশুটি যদি তাহার সীমিত জ্ঞানে কোন বিশেষ প্রার্থনা পেশ না করিয়া বলিত, "সম্রাট, যাহাতে আমার কল্যাণ হয় তাহাই দিন," তবে সম্ভবতঃ সে কোন একটি পরগণার জায়গীর লাভ করিয়া পুরুষানুক্রমে তাহা ভোগদখল করিতে পারিত।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, শিশুটি কেন সম্রাটের নিকট শুধু একটি পুতুল চাহিল ? উত্তর এই যে, শিশুটি দুইটি বিষয়ে চরম অজ্ঞ ছিল ঃ প্রথমটি তাহার নিজ প্রয়োজন সম্বন্ধে অজ্ঞতা, দ্বিতীয়টি সম্রাটের দান-ক্ষমতা সম্পর্কিত অজ্ঞতা। এই অবোধ শিশু অপেক্ষাও সাধারণ মানুষ মহা-বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনাতীতভাবে অবোধতর এবং দান ক্ষমতায় আল্লাহ্ তাআলা সকল তুলনার ঊর্ধ্বে। মানব-জীবন ইহকাল ও পরকালে বিস্তৃত এবং তাহার সম্ভাবনা অপরিসীম। মানুষ আল্লাহ্ হইতে পারে না, কিন্তু তাহার সুন্দরতম ছাঁচে গড়া সত্তা ইহকাল ও পরকাল বিস্তৃত প্রগতির মাধ্যমে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হইয়া উলুহিয়াতের অর্থাৎ ঈশরত্বের সীমান্তবর্তী হইতে পারে। তাহার এই বিরাট বিশাল জীবনের প্রয়োজন সম্পর্কে তাহার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। এই কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার অপার করুণায় মানুষের জীবন-পথকে সহজ ও সরল করার জন্য বিশেষ বিশেষ বাসনার পূজা অর্থাৎ শির্‌ক হইতে বিরত থাকিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছেন, "হে আমাদের রব, আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত মংগলময় কর।" আল্লাহ্‌র নিকট সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিয়া এই প্রার্থনার অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করাই প্রকৃত মু'মিনের কর্তব্য এবং ইহা হইতে সামান্যতম বিচ্যুতিও শির্‌ক। বাসনা-কামনার পূজাই নফসের এই বুলন্দ মুকাম অর্থাৎ চিত্তের এই সুউচ্চ আসন হইতে বিচ্যুতি তথা শির্‌কের কারণ।

বাসনা-দেবতার পূজার জন্য প্রয়োজন হয় লক্ষ লক্ষ উপদেবতার পূজা। বাসনা-পূজার অর্থ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাকেই ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে সংগত মনে করা। জীব-মাত্রেরই বাসনা আছে এবং বাসনা তাহাকে সক্রিয় রাখে। বাসনা না থাকিলে কর্ম থাকিত না, আর কর্ম না থাকিলে সৃষ্টির গতি ও বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হইত। ন্যায় ও সততার সহিত বাসনা পরিতৃপ্তির চেষ্টা অন্যায় নহে, শির্‌কও নহে। বাসনা পরিতৃপ্তির ন্যায়সংগত প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে কোন কিছুই লাভ করা সম্ভব নয় এবং কুরআনুল করীমও বলেন, "মানুষ যাহার জন্য চেষ্টা করে, তাহা ব্যতীত কিছুই তাহার নহে।" কিন্তু বাসনা-পরিতৃপ্তিকেই যে ব্যক্তি জীবনের চরম-সার্থকতা মনে করে এবং বাসনা-পরিতৃপ্তির জন্য ভাল-মন্দ নির্বিচারে নিজ কর্মপন্থা বাছিয়া লয়, সেই মুশরিক; তাহারই বাসনা-পরিতৃপ্তি-প্রচেষ্টার নাম বাসনা-পূজা, অর্থাৎ শির্‌ক। যে ব্যক্তি পরকালের বিনিময়ে ইহকালের সুখ ক্রয় করিতে চাহে অর্থাৎ যাহার নিকট পরিণামদর্শিতা

ভাবালুতা মাত্র এবং যাহা আপাতঃ তাহাই বাস্তব ও তাহাই মধুর, সে ব্যক্তিই বাসনার পূজারী হয়। এই মানসিকতাকে উদ্দেশ্য করিয়া কুরআনুল করীম বলেন, 'ইহারা আখিরাতেই জীবনের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন ক্রয় করে।' বাসনার অন্বিষ্ট বস্তু হইতেছে শক্তি, সম্পদ ও কাম। এই তিনটিই বাসনা-দেবতার ত্রি-অবতার। সম্পদ ও শক্তিলাভ এবং কাম পরিতৃপ্তির প্রধানতঃ তিনটি উপায় আছে। প্রথমতঃ নিজ কর্ম ও সাধনা। দ্বিতীয়তঃ, কোন শক্তিশালী ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ। তৃতীয়তঃ কোন অতিপ্রাকৃত (Supernatural) শক্তির কৃপা লাভ। কর্ম ও সাধনার ক্ষেত্রে মুশরিকের নিকট সিদ্ধি লাভের জন্য চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি, জাল-জোচ্চুরী, মিথ্যা-ধাপ্পা, শঠতা-প্রবঞ্চনা ও জেনা-ফাসাদ সকল কিছুই সংগত। পরানুগ্রহ লাভের ক্ষেত্রে মুশরিক শক্তিশালী ব্যক্তির যাবতীয় অপকর্মের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন দান করে এবং চাটুকারিতার মাধ্যমে তাহার মনস্তুষ্টি বিধানের প্রয়াস পায় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দাসত্বের পরিবর্তে মানুষের দাসত্ব করে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, নিজ শক্তি-সম্পদ-বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য গণদেবতার পূজাও ব্যক্তি-পূজার মতই শির্‌ক্। রাজনীতি ক্ষেত্রে এভাবেই ক্ষমতাবিলাসী ব্যক্তিরা অবস্থা-বিশেষে জনতাকে তুষ্ট করার জন্য শির্‌ক্ করিয়া থাকেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে শির্‌কের পরিণতি যে কত মারাত্মক, মুসলমান জাতির ইতিহাসেই আমরা তাহার দৃষ্টান্ত পাই। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রাথমিক ঘোষণায় বলেন, "আমি যতক্ষণ আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগত থাকিব, ততক্ষণ আমি তোমাদের আনুগত্যের অধিকারী।" কিন্তু পরবর্তীকালে খিলাফতের স্থলে সালতানাত কায়েম হইবার পর দামেস্ক ও বাগদাদের খলীফা নামধারী সুলতানগণ ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান লংঘন করিয়া নিজেরা মুশরিকের পরিচয় দেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে অনাচার স্থায়ী আসন করিয়া লয়। মুজাহিদ ইমাম ও মুজতাহিদগণ কুরআন ও সুন্নাহ্‌বিরোধী এসকল কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তাহারই ফলে ইমাম আবু হানিফা, শাফিয়ী, মালেক, হাম্বল, ইবনে তাইমিয়া প্রভৃতিকে শাহাদৎ বরণ করিতে হয়। এমতাবস্থায় উলামা শ্রেণীর মধ্য হইতে একদল দরবারী আলিম স্বর্ণের বিনিময়ে সুলতানদের সমর্থনে আগাইয়া আসেন এবং মুশরিকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইহারা কলেমা তাইয়েবা—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্,'—"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন প্রভু নাই"-এর নূতন রূপ দেন 'লা মা'বুদা ইল্লাল্লাহ্,'—"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই।"

ইবাদতের অর্থকে তাহারা উপাসনাতেই সীমিত করিয়া দেন। সেই সংগে এই দরবারী আলিমেরা কুরআনুল করীমের বাণী—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

"হে মু'মিনগণ, আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের আনুগত্য কর।" (৪ : ৫৯)

এই বাক্য হইতে 'হে মু'মিনগণ' কথাটি বাদ দিয়া মু'মিন-মুশরিক নির্বিশেষে ক্ষমতাসীনদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য মুসলিম জনতার প্রতি আহ্বান জানান। তাহাদের ভ্রান্ত প্রচারণায় মুসলিম জনসাধারণের এক বিরাট অংশ এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য ভুলিয়া কুর-আন ও সুন্নাহ্‌র নীতি লংঘনকারী মুশরিক সুলতানদের অনুগত হইয়া নিজেরাও শির্‌কের শিকারে পরিণত হয়। এইভাবে স্বৈরা-চারী সুলতানগণ, তাহাদের বশংবদ আমীর-ওমরাহবৃন্দ, মোসাহেব, দরবারী আলিমশ্রেণী এবং বিভ্রান্ত ও ভীরু, দুর্বল জনসাধারণের সমবায়ে সমগ্র মুসলিম জাহানে কায়েম হয় অবাধ শির্‌কের রাজত্ব; আর তাহার পরিণতিতেই বাস্তবায়িত হয় আল-কুরআনের সাবধান বাণী—মুসলিম জাতির ভাগ্যে নামিয়া আসে আল্লাহ্‌র লানত পরাধীনতা দারিদ্র্য, অশিক্ষা, জরা ও ব্যাধির রূপে লইয়া। অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কৃপালাভ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে দেখা যায়, মৃন্ময় প্রতীক-পূজা এবং মাজার ও পীর পূজা। মানুষ যখন আত্ম-প্রচেষ্টায় ঈপ্সিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়, স্বীয় শ্রম ও সাধনায় সাফল্য লাভের নিশ্চয়তা সম্পর্কে সন্দি-হান অথবা শ্রম ও সাধনার ঝক্কি-ঝামেলা এড়াইয়া সহজে ফায়দা হাসিল করিতে ইচ্ছুক হয়, তখন সে হয় প্রতীক-পূজা না হয় কোন বুজুর্গ ব্যক্তির পূজা অথবা পীর-পূজার পথ অনুসরণ করে। এ স্থলে মনে রাখা দরকার যে, যে মনোভাব লইয়া মৃন্ময় প্রতীক, পীর বা মাজার পূজা করা হয়, আল-কুরআনে নির্দেশিত আল্লাহ্‌র ইবাদতের তরীকার সহিত তাহার কোনরূপে সামঞ্জস্যই নাই। আল্লাহ্‌র ইবাদতের অর্থ, তাঁহার দ্বীনের বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন গঠন ও সেই বিধি-বিধানের আওতায় নিজ বাসনার পরিতৃপ্তি বিধান করা এবং নিজ কর্ম-ফলের জন্য সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা। কারণ কেবলমাত্র কর্মের দ্বারা বাসনার সর্বাংগীন মংগলময় পরিতৃপ্তি হয় না। মংগলময় কর্মফলের জন্য আল্লাহ্‌র রহমত অনিবার্য। 'আমি কেবলমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং একমাত্র তোমারই সাহায্য যাচ্ঞা করি'—এ আয়াতে কারীমার অর্থ এই যে, অপরিসীম সম্ভাবনার অধিকারী সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবের ইহকাল ও পরকালের সর্বাংগীন মংগলের জন্য একমাত্র তাঁহারই

নিকট সাহায্য যাচ্ঞা করা কর্তব্য এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিছুর নিকট নতি স্বীকার করা মানব-মর্যাদার ঘোর পরিপন্থী। জীব মাত্রেরই বাসনা আছে এবং সেই বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য কর্ম করা প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য। কিন্তু ন্যায়নীতির সমস্ত সীমা অতিক্রম করিয়া ছলে বলে বা কৌশলে বাসনা পরিতৃপ্তির প্রয়াসই বিশ্বমানবের সকল দুঃখ ও দৈন্যের কারণ। সুতরাং একজন মু'মিন কোন কারণেই স্বীয় বাসনা চরিতার্থের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারও নিকট নতি স্বীকার করিবে না। রসূলে করীম (দঃ) বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার এক হস্তে সূর্য ও অপর হস্তে চন্দ্র আনিয়া দিলেও তিনি সত্যপথ হইতে বিচ্যুত হইবেন না—ইহাই মু'মিন-মনের অটল বিশ্বাসের যথার্থ অভিব্যক্তি। যাহার দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন এই বিশ্বাসের অভিব্যক্তি, তিনিই প্রকৃত মু'মিন এবং কাজ ও কথায় তিনিই বলিতে পারেন, "আমি কেবল তোমারই দাসত্ব করি এবং একমাত্র তোমারই সাহায্য যাচ্ঞা করি।"

৩.

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইসলামে আল্লাহ্‌র নিকট কিছু যাচঞা করার অর্থ হইতেছে, যাহা যাচঞা করা হইবে তাহা লাভের জন্য ইসলামের বিধি-নিষেধের সীমার মধ্যে কর্ম ও প্রচেষ্টা করা এবং কর্মফলের জন্য সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল থাকা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদি কেহ বিদ্যার্জনের বাসনা করেন এবং যদি আল্লাহ্‌র নিকট যাচ্ঞা করেন, "রাব্বি, জিদনী ইলমান"—"হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর", তাহা হইলে তাহার কর্তব্য হইবে, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালানো এবং নিজ কর্মফলের জন্য আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা। প্রয়াসনিরপেক্ষ বাসনা-পরিতৃপ্তির কোন ব্যবস্থা ইসলামে নাই। আল-ফাতিহার পঞ্চম আয়াতে করীমায় আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকীম অর্থাৎ সরল পথে চলিবার বাসনা করিতে নির্দেশ দিতেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিতে শিখাইতেছেন, 'আমাদিগকে সরল পথে পরিচালিত কর।' এই সিরাতুল মুস্তাকীম কোন্ পথ, তাহার পরিচয় দিতে গিয়া কুরআনুল করীম বলেন, "যাহা-দিগকে পুরস্কৃত করিয়াছ তাহাদের পথ, যাহারা অভিশপ্ত ও যাহারা বিপথগামী তাহাদের পথ নহে।" সিরাতুল মুস্তাকীমের অস্তিবাচক ও নেতিবাচক উভয়দিকের অর্থই এই আয়াতে বিধৃত রহিয়াছে। কুরআনুল করীম এই তিনটি পথ অর্থাৎ (১) সরল পথ, (২) অভিশপ্তদিগের পথ ও (৩) ভ্রান্তদিগের পথের বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন। সিরাতুল

মুস্তাকীম অর্থাৎ সরল পথই মু'মিনের পথ এবং অপর দুইটি পথ কাফির ও মুশরিকের পথ। 'মাগদূব' অর্থাৎ অভিশপ্ত কথাটি সে যুগের ইহুদী জাতির উদ্দেশেই বলা হইয়াছে এবং খৃস্টানদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তাহারা বিপথগামী ও ভ্রান্ত। ইহুদী ও খৃস্টানেরা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে অপরাধী ছিল। ইহুদীরা বাহ্যিক ধর্মীয় মূল্য-বোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া বাহ্যানুষ্ঠানের কুশে ধর্মের আত্মাকে বিদ্ধ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার অতি প্রিয় রসূল হযরত ঈসা আলায়হিস সাল্লামকে রূহুল কুদ্‌স্ অর্থাৎ পবিত্র আত্মার গৌরবে গৌর-বান্বিত করিয়াছিলেন। তাই ইহুদীদের এই ঘৃণ্য আচরণের উল্লেখ করিয়া কুরআনুল করীমে আল্লাহ্ বার বার বলিয়াছেন, "তাহারা আমার রসূলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছে।" অন্যদিকে বিপথগামী খৃস্টানেরা যীশুখৃস্টের জীবনাদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া ব্যক্তিজীবনে তাঁহার প্রতি আনুষ্ঠানিক ভক্তি প্রদর্শন করাকেই ধর্মের সার সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল; খৃস্টানেরা যীশুখৃস্টকে রসূলের পর্যায় হইতে উন্নীত করিয়া তাঁহার প্রতি ঐশ্বরিক সত্তা আরোপ করে। মুসলমানেরা যাহাতে এই ভুল না করেন, এই জন্য কুরআনুল করীম বার বার রসূল (দঃ)-কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, "আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, কেবল আমার নিকট আল্লাহ্‌র বাণী অবতীর্ণ হয়।" অন্যদিকে কুরআনুল করীম সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে রাব্বুল আলামীনের দাসত্বই প্রকৃত ধর্ম এবং ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠান ইহারই সহায়ক। কুরআনুল করীম সূরা মাউনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, যে সকল ব্যক্তি এতীমের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন, বুভুক্ষুকে অন্নদান করে না এবং প্রতিবেশীর প্রতি উদাসীন, সেই সকল মুসল্লী আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত। ইহার নির্গলিতার্থ এই যে, যাহারা রাব্বুল আলামীনের খিলাফতের দায়িত্ব দাসসুলভ নিষ্ঠা ও সততার সহিত পালনের চেষ্টা না করিয়া আনুষ্ঠানিক ইবাদতকেই ধর্ম মনে করেন, তাহারা বাহ্যানুষ্ঠানের পূজারী ইহুদীদের মতই অভিশপ্ত। অন্যদিকে যাহারা সালাত, সওম, হজ্জ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ব্যবহারিক জীবনে ধর্মীয় বিধিনিষেধের প্রতি উদাসীন থাকিয়া রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে চাহে, তাহারা খৃস্টানদের মতই বিপথগামী। যাঁহারা তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবনে রাব্বুল আলামীনের খিলাফতের দায়িত্বের জীবন্ত রূপায়ণের চেষ্টা করেন এবং সেই সংগে সালাত, সওম প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের

মাধ্যমে সেই দায়িত্ব পালনের জন্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত মু'মিন।

আল-ফাতিহার শেষ আয়াতে কারীমগুলিতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সেই পথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়াছেন, যে পথের যাত্রীদেরকে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কৃত করিয়াছেন; যে পথের যাত্রীরা অভিশপ্ত এবং বিপথগামী, তাহাদের জীবন-পথ বর্জন করিতে বলিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে, যুগে যুগে কাহারা আল্লাহ্‌র দ্বারা পুরস্কৃত ও কাহারা অভিশপ্ত হইয়াছে, জানা যাইবে কেমন করিয়া? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে একমাত্র মানব-জাতির ইতিহাস। সুতরাং আল-কুরআন এখানে পরোক্ষভাবে মানব-জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা এবং জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের কারণসমূহ অবহিত হওয়ার নির্দেশ দিতেছেন। কুরআনুল করীম বহু স্থানে এই নির্দেশ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। যাহারা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কুরআনুল করীম বলেন, "দেশে দেশে ভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা সীমা লংঘন করিয়াছে তাহাদের পরিণতি কি হইয়াছে।" এই শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই কুরআনুল করীম নূহ্ (আঃ)-এর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রসূলে করীমের জমানা পর্যন্ত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। মানুষের ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবন অমোঘ প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কুরআনুল করীমে উল্লেখিত কাসাস অর্থাৎ কাহিনীগুলির ইহাই বিশেষ আলেখ্য। যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম সমাজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহারই নাম সমাজ-বিজ্ঞান। কুরআনুল করীম এই সমস্ত ঐতিহাসিক কাহিনীর মাধ্যমে সমাজ-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বসমূহের জ্ঞান দান করেন। সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে কুরআনুল করীম পাঠ করিলে ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

পরিশিষ্ট

সক্রিয় বিশ্বাসের পথই সিরাতুল মুস্তাকীম; নিষ্ক্রিয় বিশ্বাসের পথ ভ্রান্ত, আর বিশ্বাস-বর্জিত ক্রিয়ার পথ অভিশপ্ত। ইসলামের সালাত সক্রিয় বিশ্বাস—অর্থাৎ ইসলামের মৌলিক অসন্দিগ্ধ বিশ্বাস ও ইসলামী জীবনের মৌলিক নীতির সক্রিয় অনুশীলনের এক অদ্ভুত প্রতিষ্ঠান (Institution)। সালাত ব্যতীত ইসলামী জীবন গঠন একেবারেই অসম্ভব। তাই রসূলে আকরম (দঃ) বলিয়াছেন ঃ

الصلوٰة عماد الدين من اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين

"সালাত দ্বীনের স্তম্ভ স্বরূপ, যে তাহাকে কায়েম রাখে, সে নিশ্চয় দ্বীনকে কায়েম রাখে; আর যে তাহাকে ত্যাগ করে, সে নিশ্চয় দ্বীনকে ধ্বংস করে।" সালাত আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবনের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ। সালাতের সনিষ্ঠ ও সজ্ঞান প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে দুনিয়া ও আখিরাতের হাসনা অর্থাৎ মংগল। সালাতের মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের যে সমন্বয় পরিদৃষ্ট হয়, তাহা কেবল অদ্ভুতই নহে— অভূতপূর্বও। সালাতের গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন রসূলে করীমের (দঃ) জামানায় যেভাবে সালাত অনুষ্ঠিত হইত, পরিপূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখা। কুরআনুল করীমে ৮২ বার—প্রতি ক্ষেত্রেই বলা হইয়াছে اقم الصلوٰة অর্থাৎ সালাত কায়েম কর এবং কোথাও বলা হয় নাই যে, اقرا الصلوٰة অর্থাৎ সালাত পড়। এতদ্ব্যতীত যতবার সালাত কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, ততবারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাকাত দিবারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। একবারও সালাতের সহিত সওম অর্থাৎ রোজা কিংবা হজ্জের উল্লেখ নাই। ইহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সালাতের সহিত যাকাতের ওতপ্রোত সম্পর্ক। যাকাত ব্যতীত সালাত কায়েম অসম্ভব। রসূলে করীমের জামানায় হুজুরের অতি প্রিয় শিষ্য মুসলিম জাহান-সমাদৃত হযরত বিলাল আযান দিতেন—অর্থাৎ মু'মিনদিগের সালাত কায়েমের আহ্বান জানাইতেন। এখানেই হইত সালাত অনুষ্ঠানের আরম্ভ। আযান শুনিয়া মুসল্লিগণ মদীনার মসজিদে সমবেত হইতেন এবং নবীয়ে করীম মুস্তফা (দঃ) ও তাঁহার কক্ষ হইতে মসজিদে তশরীফ আনিতেন। ইহার পর রসূলে করীম (দঃ) মসজিদে উপস্থিত ও অনুপস্থিত প্রত্যেক মুসলিম ভাইবোনের অবস্থা পর্যালোচনা করিতেন এবং পরিশেষে প্রত্যেকের জাগতিক সমস্যার সমাধান করিতেন। এই কার্যের জন্য প্রয়োজন হইত বস্তু-সম্পদ; এবং সেই কারণেই যাকাত সালাতের সহিত একাংগীভাবে জড়িত। দৃষ্টান্তচ্ছলে মনে করা যাইতে পারেঃ হুজুর (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবু বকর, তোমার প্রতি-বেশী অমুক আজ সালাতে অনুপস্থিত কেন?" হযরত আবু বকর উত্তর দিলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্, তিনি ব্যবসায় উপলক্ষে দামেস্ক গিয়াছেন।" হুজুর (দঃ) বলিলেন, "আবু বকর, সালাত হইতে ফারিগ হইয়া তুমি দেখিবে তাহার বাড়ীতে কোন পুরুষ অভিভাবক আছেন

কিনা, যদি না থাকেন এবং যদি তোমাদের কোন কিছু অভাব-অসুবিধা বা সাহায্যের প্রয়োজন থাকে, তবে বায়তুল মাল হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া তাহাদের অভাব দূর করিবে।" হুজুর (দঃ) আবার বলিলেন, "আলী, তোমার প্রতিবেশী অমুক আজ সালাতে অনুপস্থিত কেন?" হজরত আলী উত্তর দিলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্, তিনি অসুস্থ।" হুজুর বলিলেন, "সালাত হইতে ফারিগ হইয়া প্রয়োজন হইলে বায়তুল মাল হইতে ঔষধ-পথ্যাদি লইয়া তাহাকে সাহায্য করিবে।" এইভাবে উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলের সকল সমস্যার আলোচনা ও সমাধান হইত এবং এইরূপে সালাতের প্রথম অংশ সম্পন্ন হইত। ইহার পর কিয়ামের তকবীর এবং রসূলে করীমের (দঃ) ইমামতে কিয়াম, রুকু ও সিজদা সম্বলিত প্রতি রুকুতে আল-ফাতিহার সহিত কুরআনুল করীমের কিছু অংশ পাঠ দ্বারা সালাতের দ্বিতীয় পর্যায় তথা সালাত অনুষ্ঠান শেষ হইত।

অনুরূপভাবে সালাতের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধের সনিষ্ঠ ও সজ্ঞান অনুশীলন ব্যতীত সালাত কায়েম হইতে পারে না। ইহাদের কোন একটিকে বর্জন করিলে যাহা থাকে, তাহা সালাত নহে—অন্য কিছু। এইরূপে মুসলিম জগৎ যদি কুরআনুল করীম নির্দেশিত সালাত কায়েম করিতেন, তবে আজিও মুসলিমেরা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অতীত গৌরবের আসনে সমাসীন থাকিতেন। সালাত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে রাব্বুল আলামীনের খিলাফতের দায়িত্ব পালন- যাহা ইসলামী দৃষ্টিভংগিতে আল্লাহ্র দাসত্বের প্রকৃত তাৎপর্য—তাহার সক্রিয় অনুশীলন এবং রহমান, রহীম প্রভৃতি রাব্বুল আলামীনের যাবতীয় গুণবাচক নাম যে সকল গুণের প্রতীক, ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে সেগুলির রূপায়ণ অর্থাৎ রসূলে করীমের উপদেশ تخلقوا باخلاق الله। "নিজেকে আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত কর"—এই বাণীর বাস্তব অনুশীলন রহিয়াছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রহিয়াছে আল্লাহ্ তাআলার নিকট একান্ত দাসসুলভ আত্মনিবেদনের মাধ্যমে সিরাতুল মুস্তাকীমের অনুসারী হইয়া সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় ও তৃতীয়াংশের আয়াত চতুষ্টয়ের অন্তর্নিহিত আদর্শে জীবন গঠনের সক্রিয় সাধনা। এই জন্যই সালাতের প্রত্যেক রুকুতে সূরা ফাতিহা পাঠের নির্দেশ রহিয়াছে। আল্-ফাতিহা যেমন কুরআনুল করীমের জ্ঞানবৃক্ষের বীজ, ঠিক তেমনি সালাত ইসলামের ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বীজ। আর এই কারণেই সালাতের সহিত সূরা ফাতিহার সম্পর্ক এত নিগূঢ়।

সকল হামদ্ আল্লাহ্র।